গদ্যগ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ

লোকসাহিত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,
মজুমদার লাইব্রেরি,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, দিনময়ী প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

লোকসাহিত্য।

সূচী।

ছেলেভুলানো ছড়া ১
কবি সঙ্গীত ৪৪
গ্রাম্যসাহিত্য ৫৩

লোকসাহিত্য।

ছেলেভুলানো ছড়া।

বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভাল লাগে বা না লাগে সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এরূপ অহমিকা অহঙ্কার নহে পরন্তু তাহার বিপরীত। যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে; তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন; যে কোন রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায় নিঃসঙ্কোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু অক্ষমতা এবং অনভিজ্ঞতাবশত সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই, সমালোচনস্থলে তাঁহাদিগকে একমাত্র নিজের অনুরাগ বিরাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্যসম্বন্ধে বেদবাক্য প্রচলিত করিতে যাওয়াই স্পর্দ্ধার কথা। কোন্ লেখা ভাল অথবা মন্দ তাহা প্রচার না করিয়া কোন্ লেখা আমার ভাল লাগে বা মন্দ লাগে সেই কথা স্বীকার করাই তাঁহাদের উচিত।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সে কথা কে শুনিতে চায়, আমি উত্তর করিব সাহিত্যে সেই কথা সকল মানুষ শুনিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের সমালোচনাকেই সমালোচনা বলা হইয়া থাকে কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমালোচনা মাত্র। প্রকৃতিসম্বন্ধে মনুষ্যসম্বন্ধে ঘটনাসম্বন্ধে কবি যখন নিজের আনন্দ বিষাদ বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিজের সেই মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা ও রচনা-কৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন তাঁহাকে কেহ অপরাধী করে না। তখন পাঠকও অহমিকাসহকারে কেবল এইটুকু দেখেন, যে, কবির কথা আমার মনের সহিত মিলিতেছে কি না। কাব্যসমালোচকও যদি যুক্তি তর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া কাব্যপাঠজাত মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন তবে সে জন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।

বিশেষত আজ আমি যেকথা স্বীকার করিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্মকথার কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণ-শক্তি বর্ত্তমান লেখকের নাই। একথা গোড়াতেই কবুল করা ভাল।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য্য এবং উপযোগিতা কি। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনটির কোন কালে কোন রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও নূতন।

ভাল করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও তেম্‌নি আছে; সেই অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্ব্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেম্‌নি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য;—তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।—স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি

ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প,—এই আবর্ত্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল—সর্ব্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোন একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই সমস্ত রেণু-জাল উড়িয়া যায়, এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে,তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর পরিচরে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্ম্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোট বড় কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে কত কম্পন কত আন্দোলন, কত গমন কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে,—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায়

আমাদের মন ঐক্য-জাল ফেলিয়া একেবারে এককক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভাল করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভাল করিয়া দেখে না, এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভাল করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পুরাণে পাঠ করা যায়, পুরাকালে কোন কোন মহাত্মা ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন; আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছা-বধিরতার শক্তি আছে; এবং এই শক্তি তাহাকে প্রতিপদেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিয়া লয় তাহাই সে উপলব্ধি করে; চতুর্দ্দিকে, এমন কি, মানস-প্রদেশেও, যাহা ঘটিতেছে যাহা উঠিতেছে তাহার সে ভালরূপ খোঁজ রাখে না।

সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখন সংলগ্ন কখন বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে তাহারা যদি কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্ত্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মত। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই একটি ছড়া উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে পাঠক-দের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমত, এই ছড়াগুলির সঙ্গে চির-কাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মত মর্য্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ স্বরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সঙ্গীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব? ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।

দ্বিতীয়ত আটঘাটবাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃত-বেশা অসংস্কৃতা ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদা-লতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি-ফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুম্ পা-ঝুম্ঝুম্ সীতারামের খেলা॥
নাচ ত সীতারাম কাঁকল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় ত জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট।
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।

একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা।
তার বোন্‌কে বিয়ে করি ঠিক দুক্কুর বেলা ॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পরসম্বন্ধ নাই সে কথা নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটা এই দেখা যাইতেছে কোন প্রকার বাচ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান্ বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো কোনপ্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনরূপ উপলক্ষ্য অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন কি, মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক্ খাইয়া জাগিয়া উঠিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকান [illegible] ইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন আগামী কল্য যে, তাঁহার শুভবিবাহ [illegible] কথার স্প [illegible] দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে কথা আপাততঃ উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক্, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ অথবা সে জন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে! সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে, যে কাহাকেও কোন কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজি-ফুল যে কি ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি, যে, যমুনাবতী নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোন যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম্‌ঝুম্ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যেলোক লইয়া গেছে তাহার কোনরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কি কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়্‌ফুল সংগ্রহ দ্বারাই শুভকর্ম্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোন পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে!

এই ত কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট্ বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটের অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিষকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস জগতের সিন্ধু-তীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজন-শীলতার অভাববশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্ত্তের মধ্যেই মুঠামুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্ত্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্ত্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মত সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্ত্ত্যলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্য্যের সহিত বালকের লীলার সর্ব্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যেই একটা ইচ্ছাময় আনন্দের সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা ত্রিপূর্ণির ঘাট, এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মত অদ্ভুত কিন্তু স্বপ্নের মত সত্যবৎ।

স্বপ্নের মত সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কি আছে? না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রবল যুক্তি দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্বাসজনকতা নামক যে গুণটি সত্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত সেটা যেমন স্বপ্নের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্দ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে, প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্ন-জগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের

মেঘদূতের মত ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পান্সী নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড় সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরাণী মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছেন সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে নাই। এই নির্ব্বোধ তখনও বুঝিতে পারিত না ঐ একটিমাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কি এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে! কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রয়াণ দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কস্মিন্ কালে কেহ ছিল এক একবার একথাও মনে উদয় হয়। হয় ত বা ছিল। হয় ত এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর কোন ছড়ায় হয় ত বা ইহার আর এক টুক্‌রা থাকিতে পারে।

এ পার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুর-বাড়ি বস্‌তে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
শালিধানের চিঁড়ে নয়রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সব্‌রি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবেগতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবুঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্যসম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ সখ্ আছে এবং বোধ করি আহারসম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাও নবপরিণীতের প্রথম প্রণয়-যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এইস্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে "শালিধানের চিঁড়ে নয়রে বিন্নিধানের খই!" যেন ঘটনার সত্যসম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদরসম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুর-বাড়ির মর্য্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি কবির অধিক লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মত। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতেই পরমুহূর্ত্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবুঠাকুরও কখন্ এমনি করিয়া শিবু সদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে কতকগুলি টুক্‌রা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্তগ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুক্‌রা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা

এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য-রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্ত্তমান এবং তাহার নিকট বর্ত্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্সা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মত উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দ্রুতগতিতে বালকের চিত্ত উপর্য্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেচে॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥
কে রেখেচে কে রেখেচে দাদা রেখেচে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান্ দে, বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ বলেরে ভাই চাল কড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে।
সোনা-মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোন ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোন ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝেঁটনবিশিষ্ট নোটন পায়রা-গুলি, বড় সাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুই কাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্যসহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে তপ্তবালুচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপ-ক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ সমস্তই স্বপ্নের মত। ওপারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, যে, স্বপ্ন রচনা করা বড় কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্য্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেইখানেই ভাব আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিষটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই!

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন আমাদের প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায় এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সে জন্য কোন কবি চুরির অভিযোগ

করে না এবং কোন সমালোচকও ভাব-বিপর্য্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস্ বা আইনকানুনের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

ওপারে জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাইঢাই গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাবরে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠেরে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিন্‌লাম, চূণ কিন্‌লাম ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেচে।
মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেচে।
চিকন্ চিকন্ চুলগুলি ঝাড়তে নেগেচে॥
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে॥
পরণে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে।

নাল গাম্‌ছা দিয়ে॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌরী বেটী কনে॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্ বাদ্দি বাজে চড়কডাঙায় ঘর॥

এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারামনামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপুর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চালকড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে—সীতারামও নহে সীতানাথও নহে, পরন্তু কোন এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী জন্তি-ফল ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে, অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই ত তিন ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য্য দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে অথচ এক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে; দুইয়ের বা'র! ঐ যে ছড়ার এক জায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না। "দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি; সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।" যেমনই সুবলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল। "আজ

সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।” সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়ত শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোন অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটা কথা হইতে আর একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনই কারণ ছিল না, মুহূর্ত্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনাচেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদিবা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোন সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন “নাল্‌গামছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে” কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ বিধবা-বিবাহ টিয়ে জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল গাম্‌ছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন্ কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। ইহার কারণ পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখ, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্ত্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মত গড়িতে হয়—যেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে

দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আপন মনের মত জিনিষ মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্ত্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোন বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছারচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিতচিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বালকের চিত্তে তেমন একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। "চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে" এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্ব্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

"পরণে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েচে।" ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্ত্ত ধারার মত, তনুগাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে তাহা ঐ একছত্রে এক মুহূর্ত্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে, "পরণে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে"—সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জালমুড়ি দিয়ে।

ঐ শেষ ছত্রে জালমুড়ি দিয়া বাগ্‌দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে ঐ জালমুড়ি দেওয়ার কথা

বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্‌দি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছপণ্ কড়ি গুণতে গুণতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে।
চাঁদ-মুখেতে রোদ্ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয়পণ কড়ি গুণিতে গুণিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্ত্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল, অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কি হইতে পারে!

এই ত এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়ত একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ সজীব হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে সমস্ত তুচ্ছ কথা বড় বড় সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদাগো দাদা সহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা।

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি ॥

দাদার বেতন অধিক নহে—কিন্তু বোন্‌টির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের স্বচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি।

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, "বউ বরণে চন্দ্রকলা।" যদিও ভগ্নীর খেলেনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্র্যবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আস্‌চে কতদূর ॥
বর আস্‌চে বাঘনাপাড়া।
বড় বউগো রান্না চড়া ॥
ছোট বউলো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা ॥
ফুলের বরণ করি।
নটে শাকের বড়ি ॥

জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিতা পল্লিরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষ্যে ন্যাওড়া গাছের বেড়া-দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথঘাট বন পুষ্করিণী ঘটকক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মত জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলা দেশের একটি মূর্ত্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়! কিন্তু সে সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে আশঙ্কা করি, কারণ, ভিন্নরুচির্হিলোকঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই, কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্ত্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক্ হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলি সম্ভব। একটা জিনিষ যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর একটা জিনিষই বা কেন অদ্ভুত হইবে? সে বলে একমুণ্ডওয়ালা মানুষকে আমি কোন প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ, সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; দুইমুণ্ডওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোন বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিতে চাহি না, কারণ, আমি ত তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সমান সত্য, কারণ, সে ত আমার অনুভবের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোন লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম। বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বল কি হে! দশ পা চলিয়া গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি বলিলেন—দশ পা চলা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য্য!—

সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়, তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বালক সেই প্রথম আশ্চর্য্যটার প্রতি প্রথম

দৃষ্টিপাত করিতেছে—সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিষ আছে, আরও অনেক জিনিষ থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, এই জন্য ছড়ার দেশে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমানাঘটিত কোন বিবাদ নাই।

আয়রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে' দেখে' ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'।
খোকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমত টিয়ে পাখী নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোন বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্ব্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত, হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই খানখা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপ্টাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল তখন কৌতুক আরও বাড়িয়া উঠে। টিয়া বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্য-স্পৃহাও বড় চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্ত্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গান বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া—ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল

নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধ করি সর্ব্বত্রই দুর্লভ!

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর-নদীর কূলে।
ছিপ্ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥
খোকা বলে পাখীটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

ক্ষীর-নদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কি সঙ্কটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীর-নদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হৌক্, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকটগোছের কোলা ব্যাং খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার বা সেই উড্ডীন চৌরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ—এ সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূর্ত্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ওপারটা ভাল দেখা যায় না। এ পারে তীরের কাছে একটা কোণের মত জায়গায় বড় বড় ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন; তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া

খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতে-ছেন এ দৃশ্যটিও বেশ;—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্রমাসের জলমগ্ন পক্বশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটীর; সেই কুটীর-প্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্নের অবসান-সূর্য্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছে এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটীরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে সেও সুন্দর দৃশ্য;— এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখীটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়াছে এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং নিমীলিতনেত্র মা দুই হস্তে সুকোমল ডানাসুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান সেই জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্দ্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্ত্তি দৃষ্টি-পথে পড়ে। সেই সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই,—প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনও সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে; কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্ধৃত করি—

"যাদু এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু এ ত বড় রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥"

"যাদু এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন্-সতীনের ঘর॥"

"যাদু এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥"

কবিসম্প্রদায় কবিত্ব-সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র-ছন্দে নারীজাতির স্তব গান করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত স্তব-গানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাত-সারে একটুখানি সরল কৌতুকও আছে। সীতার ধনুকভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ

হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিষ্টি আছে, যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ, বিচারে জয়—এ সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না; উল্‌টিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন, এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়ক মহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল সেও অনেক ভাল। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পূরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখন সে উত্তরগুলি জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে যে, কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মত। কিন্তু সে জন্য নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন "যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ!" ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরও পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মত আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে! বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর কিছু নাই!

যাহা হউক্, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচম্‌কা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না! প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম,

সেটা যদি বা ঠিক সেনেটহলের মত না হইত, অনেকটা ঈড্‌ন্‌গার্ডনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটুখানি জম্‌জমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি—যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদূর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ—সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটিমাত্র স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজে বিশ্বাস ও সরল আনন্দে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জ্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মত ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন কি, উহাদের মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত নীতি এবং সর্ব্বজনদুর্ব্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিছু না হোক্, উহাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি! বিবেচনা করিয়া দেখুন্ আমরা যদি কখনো আমা-দের বর্ত্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি তবে কি তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি?

আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা!
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা!
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেব,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,

দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা !

এ কোন্ চাঁদ ! নিতান্তই বাঙালীর ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটীরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাঁশ-বনের রন্ধ্র গুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিবিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা, এতবড় লোকটা,—যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্য-পাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো ধানের কুঁড়ো কালো গরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত ! আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বৌ-কথা-কওয়ের গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব্বজাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ্দ করিয়া বসিতাম—অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। এমন ঘোরতর বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধ নাস্তিকপ্রকৃতি তাহারা ছিল না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাংলা দেশের চাঁদামামা বাংলা-দেশের সহস্র কুটীর হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাঁ-ও বলিত না, না-ও বলিত না; এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন্, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্ব্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার

সময়, অমনি পথের মধ্যে, কৌতুকপ্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুক্‌রা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ-দুঃখ শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দ্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দ্দম, পদচিহ্নরেখাসমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে; কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই,—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকালের একটুক্‌রা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্ত্তী বর্ত্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে;—আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

"ও পারেতে কালো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন-কেমন করে॥"

"এ মাসটা থাক্‌, দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে॥"

"হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোন চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ও পারেতে কালো রং; বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্!

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না! চিরকালই এম্‌নি হইয়া আসিতেছে! বহুপূর্ব্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
——————কিং পুনর্দূরসংস্থে।

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—
"গুণবতী ভাই আমার, মন-কেমন করে!"

"হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি!"—

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্ম্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্ব্বিষহ বেদনা-পরম্পরা কে বলিয়া দিবে! দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সে দিন আর কি বাধা মানিতে পারে! সেই ঘর সেই খেলা সেই বাপ মা সেই সুখশৈশব সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি এক দণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! সে দিন কিছুতে আর একটি মাসের

প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতে ছিল না—বিশেষত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত, মেঘচ্ছায়াশ্যামল, কূলে কূলে পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি!—ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জ্জনা করিবেন, এমন কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন! ভাইয়ের প্রতি "গুণবতী" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল! সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একটি দিনের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে! জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত!—হয় ত ভুলটি গুরুতর নহে; হয় ত ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্য্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন কি, পত্নীশ্রেণীয় সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃসম্বোধনে অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না!

আমাদের বাংলা দেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর অম্বিকা-পূজা এবং বাঙালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্ম্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন্——

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন তাঁহার পূর্ব্বব্যবহার কোন ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি।

তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্ব্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্ত্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্ত্তন করিয়া নিয়ে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন্ গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥

মা অলঙ্কার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসী ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন; আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোন প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে। মা বাপের পূর্ব্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্ব্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সবচেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড় কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক-খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহ বিবাদ এবং সমস্ত খেলাধূলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়ন-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জ্জন গোপনে দাঁড়াইয়া ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর

স্নেহ-উৎসের নির্ম্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি বড় বড় অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে!

দোল্ দোল্ দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আস্‌বে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূর ভবিষ্যৎবর্ত্তী বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে,—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষত-বেদনার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে;—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না!

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ী-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্ব্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কুণো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥

আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পাল্‌কী বহাতে॥
সরু-ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু উড়্‌কিধানের মুড়্‌কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়ীকে যে কি উপায়ে ভুলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ সেও একটা বিষম শেল। অথচ, অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে! ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙা-চোরা, হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পর্‌ভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আই গো চিন্তে পার।
গোটাদুই অন্ন বাড়॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥

পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিলে সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা চল্‌ শ্বশুরবাড়ি॥

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ঘরের বধূশাসনের জন্য পুলিসের আইনের চেয়ে সেই গার্হস্থ্য আইন, কন্‌ষ্টেবলের হ্রস্ব যষ্টির অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার হুড়্‌কো ঠেঙা ছিল ভাল। আজ আমরা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি হইতে ফিরাইবার জন্য আদালত করিতে শিখিয়াছি, কাল হয় ত মান ভাঙাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু হাল নিয়মেই হোক্‌ আর সাবেক নিয়মেই হোক্‌, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা —এত বড় অস্বাভাবিক বর্ব্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ কাটম্‌ বোসের বাটম্‌ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি॥
টক্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপ দাড়ি॥

চোখ খাওগো বাপ মা, চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো ॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েচে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেচে ॥

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে!

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট্,—যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা খুঁকু বা খুঁকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত—আর, মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্ব্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানব-হৃদয়ের নবীন অরুণোদয়-রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চির-পুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নবনব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুঁকুদেবতার কত মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে কখন পাখী, কখন চাঁদ, কখন মাণিক, কখন ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কি;
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি ॥

ভালবাসার মত এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে

তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখী। শত সহস্রবার প্রতিষেধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না, যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে! সে মনে মনে জানে আমি উড়িতে পারি, এই জন্যই সে লোহার শলাকাগুলাকে বারম্বার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোন আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা! অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যের অসম্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালবাসা জোর করিয়া বলে, তোমরা কি মনে কর আমি পারি না! তাহার এই অসঙ্কোচ স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মত প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, আমরা বলি, তাও ত বটে, কেনই বা না পারিবে! যদি কোন সঙ্কীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎবদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে, খাইবে কি? সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়—"নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।" শুনিবামাত্র আমরা মনে করি ঠিক সঙ্গত উত্তরটি পাওয়া গেল! অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালবাসার আর একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়। ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্ব্বেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন—দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরমুহূর্ত্তেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয় তখন কোন জ্যোতির্ব্বিৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস

করেন না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বরপূর্ব্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, যাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব!
তুই চাঁদের শিরোমণি!
ঘুমরে আমার খোকামণি!

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে এ সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি, অকাট্য এবং নূতন— ইহার কোথাও কোন ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদুর পর্য্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ তবে ত মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্য্য নহে। তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কি ছিল!

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালবাসারই একাধিপত্য। ভালবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে আমার অপেক্ষা আর কিছু কেন প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনও সে স্বর্গেই আছে! কিন্তু হায়, মর্ত্ত্য পৃথিবীতে স্বর্গের মত ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কি হইতে পারে? তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া

সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, একথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালবাসা একদিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখীতে একমুহূর্ত্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আরএকদিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্য্যন্ত কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোন জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম না কি খোকার চোখে আসিয়া থাকে এই জন্য তাহার উপরে সর্ব্বদাই ভালবাসার সৃজন-হস্ত পড়িয়া সেও কথন্ একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে!

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চারকড়া দিয়ে কিন্‌লেম ঘুম মণির চোখে আয়রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন ত আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেই-জন্য সেই হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চারকড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরীর তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

খেনা নাচন্ খেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার যাদুর জন্যে যায়ে নাচনা কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন্, পায়ের নাচন্, বাটা মুখের নাচন্,
নাটা চক্ষের নাচন্, কাঁটালি ভুরুর নাচন্,
বাঁশির নাকের নাচন্, মাজা বেঙ্কুর নাচন্,
আর নাচন্ কি ?
অনেক সাধন করে যাদু পেয়েছি॥

ভালবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখন বৃহৎকে তুচ্ছ, এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। "নাচরে নাচরে, যাদু, নাচন্‌খানি দেখি!" নাচন্‌খানি! যেন যাদু হইতে তাহার নাচন্‌খানিকে পৃথক্ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মত দেখা যায়; যেন সেও একটি আদরের জিনিষ! "খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমালিদের পাড়া।" এস্থলে "বেড়ু করতে" না বলিয়া "বেড়াইতে" বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকা বাবুর বেড়ানর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু "বেড়ু"করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানটি একটু বিশেষ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

অবশ্য, খোকা বাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা এবং তাঁহার, যে, নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্‌মচ্‌ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র! কিন্তু খোকা বাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোট ঘুন্টি-দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া সেটা হইল জুতুয়া! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।

সর্ব্বশেষে, উপসংহারকালে আর একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে "নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি" ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্রমুখখানির মধ্যে এমন কি আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, মনে হয়, সমস্ত সংসার, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম এই আনন্দ-ভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগিগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বন্‌কে যাব—সেখানে খাব কি।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়, এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্ত্ত্যের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন্ অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়্ কর্‌তে তেলিমাগিদের পাড়া।
তেলিমাগিরা মুখ করেছে কেন্‌রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ, তেলিমাগিদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন্ যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা, সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্ত্তন-শীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে

শিশু-হৃদয়কে উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে; এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু-মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

১৩০১

কবি সঙ্গীত।

বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। এক দিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলী-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

গীতিকবিতা বাংলা দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদা-মঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য এই কবির গানগুলিও

গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।

না থাকিবার কিছু কারণও আছে। পূর্ব্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেই জন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, তার ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল—তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।

কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম্মশ্রান্ত বণিক্‌সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশিসহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার

তারেও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঝঙ্কার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎরাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। প্রথমে নিয়ম ছিল, দুই প্রতিপক্ষদল পূর্ব্ব হইতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিতেন—অবশেষে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—আসরে বসিয়া মুখে মুখেই বাকযুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কেবল প্রতিপক্ষকে আহত করা হয়, তাহা নহে—ভাষা ভাব ছন্দ সমস্তই ছারখার হইতে থাকে। শ্রোতারাও বেশিকিছু প্রত্যাশা করে না—কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহার উপরে আবার চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁশি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার—বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারেন না।

সৌন্দর্য্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘনঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সঙ্গীত যখন বর্ব্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক্‌, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘনঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। একশ্রেণীর কবিতার অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ়লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস, ভাব ভাষা এমন কি ব্যাক-

রণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। অথচ, তাহার যথার্থ কোন নৈপুণ্য নাই, কারণ, তাহাকে ছন্দোবন্ধ অথবা কোন নিয়ম রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় না; কিন্তু যে শ্রোতা কেবল ক্ষণিক আমোদে মাতিয়া উঠিতে চাহে, সে এত বিচার করে না, এবং যাহাতে বিচার আবশ্যক এমন জিনিষও চাহে না।

"গেল গেল কুল কুল, যাক্ কুল,
তাহে নই আকুল;
লয়েছি যাহার কুল, সে আমারে প্রতিকূল;
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন্ আমায়,
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়।
এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাবো সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়।"

পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি-উদ্ধৃত গীতাংশে এক কুলশব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে কিন্তু ইহাতে কোন গুণপণা নাই। কারণ, উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র—কিন্তু শ্রোতৃগণের কোন বিচার নাই, তাঁহারা অত্যন্ত সুলভ চাতুরীতে মুগ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। এমন কি, যদি অনুপ্রাস-ছটার খাতিরে কবি, ব্যাকরণ এবং শব্দ শাস্ত্র সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেন, তাহাতেও কাহারও আপত্তি নাই। দৃষ্টান্ত—

"একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য,
কাব্যরসে রসিকে,
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে "দাম্ভীর্য্য" নাই,
আর আর বৌ যেমন ধারা ব্যাপিকে।
অধৈর্য্য হেরে তোরে স্বজনী, ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করব সাহায্য,
বলি, তাই বলে যা আমায়।"

একে বাংলা শব্দের কোন ভার নাই, ইংরাজি প্রথামত তাহাতে অ্যাক্‌সেণ্ট নাই, সংস্কৃত প্রথামত তাহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া;—অনেক নির্জ্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাংলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা।

উপস্থিতমত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুঁটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে;—ভাবের কবিত্বসম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী শাক্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ সহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প আকারে প্রফুল্ল এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন আকারে সম্মিশ্রিত।

অনেক জিনিষ আছে যাহাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিলে তাহা বিকৃত এবং দূষণীয় হইয়া উঠে। "কবি"র গানেও সেইরূপ অনেক ভাব তাহার যথাস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, যে, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্ম্মল নহে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে তাহার

সৌন্দর্য্যপরিবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষা এবং শিথিল ছন্দসহযোগে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে।

বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্যহিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না—সমগ্রের প্রভাবে তাহার দূষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর এবং উন্নতভাবের সৃষ্টি না হয় সে, হয়, সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে নাই, নয়, সে যথার্থ কাব্যরসের রসিক নহে।

কিন্তু আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং গম্ভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারম্বার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রীপক্ষ এবং পুরুষপক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক দোষারোপ করা;—সেই সখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্কার জন্মে।

যাহাদের প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান দৃঢ় তাহারা সর্ব্বদা অভিমান প্রকাশ করিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহাদের মানে আঘাত লাগিলে, হয়,

তাহারা স্পষ্টরূপে তাহার প্রতিকার করে, নয়, তাহা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিয়া যায়। প্রিয়জনের নিকট হইতে প্রেমে আঘাত লাগিলে, হয়, তাহা গোপনে বহন করে, নয়, সাক্ষাৎভাবে সম্পূর্ণরূপে তাহার মীমাংসা করিয়া লয়। আমাদের দেশে ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, পরাধীনতা যাহার অবলম্বন সেই অভিমানী, যে একদিকে ভিক্ষুক তাহার অপরদিকে অভিমানের অন্ত নাই, যে সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম সে কথায় কথায় অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অভিমান জিনিষটি প্রকৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

দুর্ব্বলতা স্থলবিশেষে এবং পরিমাণবিশেষে সুন্দর লাগে। স্বল্প উপলক্ষ্যে অভিমান কখন কখন স্ত্রীলোকদিগকে শোভা পায়। যতক্ষণ নায়কের প্রেমের প্রতি নায়িকার যথার্থ দাবী থাকে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে ক্রীড়াচ্ছলে অথবা স্বল্প অপরাধের দণ্ডচ্ছলে পুরুষের প্রেমাবেগকে কিয়ৎকালের জন্য প্রতিহত করিলে সে অভিমানের একটা মাধুর্য্য দেখা যায়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতের দ্বারা নায়ক যখন সেই প্রেমের মূলেই কুঠারাঘাত করে, তখন যথারীতি অভিমান প্রকাশ করিতে বসিলে নিজের প্রতি একান্ত অবমাননা প্রকাশ করা হয় মাত্র, এই জন্য তাহাতে কোন সৌন্দর্য্য নাই এবং তাহা কাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্বামিকৃত সকল প্রকার অসম্মাননা এবং অন্যায় স্ত্রীকে অগত্যা সহ্য এবং মার্জ্জনা করিতেই হয়—কিঞ্চিৎ অশ্রুজলসিক্ত বক্রবাক্যবাণ অথবা কিয়ৎকাল অবগুণ্ঠনাবৃত বিমুখ মৌনাবস্থা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই—অতএব আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা অভিমান জিনিষটা সত্য, সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র সুন্দর নহে ইহাও নিশ্চয়—কারণ যাহাতে কাহারও অবিমিশ্র স্থায়ী হীনতা প্রকাশ করে তাহা কখনই সুন্দর হইতে পারে না।

কবিদলের গানে রাধিকার যে অভিমান প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রায়শই এইরূপ অযোগ্য অভিমান।

সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হল অপমান।
শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে।
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়।
যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি করবে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে।
যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান।
রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান।

এই কয়েক ছত্রের মধ্যে প্রেমের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণের উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, রাধিকার উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, এবং চন্দ্রাবলীর উপরেও অবজ্ঞার উদয় হয়।

কেবল নায়ক নায়িকার অভিমান নহে, পিতামাতার প্রতি কন্যার অভিমানও কবিদলের গানে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়! গিরিরাজ-মহিষীর প্রতি উমার যে অভিমানকলহ তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে না—তাহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট বোধ হয়। তাহার কারণ, মাতৃস্নেহে

উমার যথার্থ অধিকার সন্দেহ নাই; কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত, তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দর ভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।

মাতা কন্যা এবং নায়ক নায়িকার মান অভিমান, যে, কবিরদলের গানের প্রধান বিষয়, তাহার একটা কারণ, বাঙালীর প্রকৃতিতে অভিমানটা কিছু বেশি; অর্থাৎ অন্যের প্রেমের প্রতি স্বভাবতই তাহার দাবী অত্যন্ত অধিক; এমন কি, সে প্রেম অপ্রমাণ হইয়া গেলেও ইনিয়া বিনিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া আপনার দাবী সে কিছুতেই ছাড়ে না; আর একটা কারণ, এই মান অভিমানে উত্তর প্রত্যুত্তরের তীব্রতা এবং জয় পরাজয়ের উত্তেজনা রক্ষিত হয়। কবিওয়ালাদের গানে, সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।

ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসররঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্ত্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণেরই আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গভীরতা লাভ করিয়াছে। তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, অতএব, এক্ষণে তাহার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হৌক্ না কেন, তাহাদের আনন্দবিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য, এবং আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। এখনকার দিনে খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলি শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করিতেছে। কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের

ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার, এবং সর্ব্ব বিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে, যে, তাহার অবসর বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ এবং সমগ্রভাবে কবিরদলের গানের সমালোচনা করিয়াছি। স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে—কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা, এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়—এবং সেরূপ হইবার প্রধান কারণ এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমত রচিত।

তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবিরদলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ,—এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।

১৩০২।

গ্রাম্যসাহিত্য।

একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা রাজসাহীর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠ ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোট ছোট গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মত মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না শুধু জল ছলছল করিতেছে, ইহার মধ্যে যখন সূর্য্য অস্ত যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ বারো জন লোক একখানি

ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্ত্তে এক একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুত-বেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধূয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুমতী, ক্যান্ বা কর মনভারী!
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরী!

ভরা বর্ষার জলপ্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কি না সে সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মনভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দেবন্ধে সুরেতালে মাঠেঘাটে জলেস্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।

জগতে যত প্রকার দুর্ব্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য,—সেই দুর্গ্রহ শান্তির জন্য কবিরা ছন্দোরচনা এবং প্রিয়-প্রসাদবঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন গানের মধ্যে শুনিলাম "পাবনা থেকে আনি দিব টাকা-দামের মোটরী"—তখন ক্ষণকালের জন্য মনের মধ্যে বড় একটা আশ্বাস অনুভব করা গেল। মোটরী পদার্থটি কি তাহা ঠিক জানি না কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাকার বেশি নহে কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। জগতের এক প্রান্তে পাবনা জিলায় যে এমন একটা স্থান আছে সেখানে প্রতিকূল প্রণয়িনীর জন্য অসাধ্যসাধন করিতে হয় না, পাবনা অপেক্ষা দুর্গম স্থানে যাইতে এবং "মোটরী" অপেক্ষা দুর্লভ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয় না ইহা মনে করিলে ভবযন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত সুসহ বলিয়া বোধ হয়।

কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানসসরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লানমুখে হাঁকিয়া বসিতেন। এবং উজ্জয়িনীর প্রথমশ্রেণীর যুবতীরা শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

অন্তত কাব্য পড়িয়া এইরূপ ভ্রম হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না। শুদ্ধমাত্র মন্ত্র পাঠের দ্বারা একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ভল্‌টেয়ার বলিয়াছেন, যায়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক বিষও থাকা চাই। মন-ভারি-করা যুবতীর পক্ষে আকাশের তারা নন্দনের পারিজাত এবং প্রাণ সমর্পণের প্রস্তাব সন্তোষজনক হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজুবন্ধ বা চরণচক্রের প্রয়োজন হয়। কবি ঐ কথাটা চাপিয়া যান,—তিনি প্রমাণ করিতে চান্ যে, কেবল মন্ত্রবলে, কেবল ছন্দ এবং ভাবের জোরেই কাজ সিদ্ধ হয়; অলঙ্কারের প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু তাহা কাব্যালঙ্কারের। এদিকে আমাদের পাবনার জনপদবাসিনীরা কাব্যের আড়ম্বর বাহুল্য জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের চিরানুরক্ত গ্রামবাসী কবি মন্ত্র তন্ত্র বাদ দিয়া একেবারেই সোজা টাকা দামের মোটরির কথাটা পাড়িয়া বসেন; সময় নষ্ট করেন না।

তবু একটা ছন্দ এবং একটা সুর চাই। এই জগৎ প্রান্তে এই পাবনা জিলার বিলের ধারেও তাহার প্রয়োজন আছে। তাহাতে করিয়া ঐ "মোটরি"র দাম এক টাকার চেয়ে অনেকটা বাড়িয়া যায়। ঐ "মোটরি"টাকে রসের এবং ভাবের পরশ পাথর ছোঁয়াইয়া দেওয়া হয়। গানের সেই দুটো লাইনকে প্রচলিত গদ্যে বিনা সুরে বলিলে তাহার মধ্যে যে একটি রূঢ় দৈন্য আসিয়া পড়ে ছন্দে সুরে তাহা নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া

যায়—সংসারের প্রতিদিনের ধূলিস্পর্শ হইতে ঐ ক'টি তুচ্ছ কথা ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া উঠে।

মানুষের পক্ষে ইহার একটা একান্ত প্রয়োজন আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা সে সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবৃত তাহাকে সে ছন্দে লয়ে মণ্ডিত করিয়া তাহার উপর নিত্য সৌন্দর্য্যময় ভাবের রশ্মিপাত করিয়া দেখিতে চায়।

সেই জন্য জনপদে যেমন চাষ বাস এবং খেয়া চলিতেছে, সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের মোটরি নির্ম্মাণ হইতেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্য্যও চলিতেছে, তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।

পদ্মা বাহিয়া চলিতে চলিতে বালুচরের মধ্যে যখন চকাচকীর কলরব শুনা যায় তখন তাহাকে কোকিলের কুহুতান বলিয়া কাহারও ভ্রম হয় না,—তাহাতে পঞ্চম মধ্যম কড়িকোমল কোন প্রকার সুর ঠিকমত লাগে না ইহা নিশ্চয়, কিন্তু তবু ইহাকে পদ্মাচরের গান বলিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। কারণ, ইহাতে সুর বেসুর যাহাই লাগুক্, সেই নির্ম্মল নদীর হাওয়ায় শীতের রৌদ্রে অসংখ্য প্রাণীর জীবনসুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠে।

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে

কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক্-সঙ্গীতের মত তাহা নিখুঁৎ সুরতালের অপেক্ষা রাখে না। মেঘদূতের কবি অলকা পর্য্যন্ত গিয়াছেন, তিনি উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি,—আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়িয়াও পাবনা সহরের বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই,—যদি পারিত, তবে তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গত্যাগ করিত; কল্পনার সঙ্কীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে—কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে—পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়,—তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য-সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, সেই জন্যেই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন "জয় রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতূহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন; প্রবীণা পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালকবালিকা যুবক যুবতী একাগ্র মনে বহুশত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালী পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।

গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন

অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে সঙ্কীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সর্ব্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।

নীচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি,—যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দমিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্ম্মগত প্রভেদ ছিল না।

আমার হাতে যে ছড়াগুলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কি নূতন নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না। কিন্তু দুই এক শত বৎসরে এ সকল কবিতার বয়সের কমিবেশি হয় না। আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীর কবি যে ছড়া রচনা করিয়াছে তাহাকে এক হিসাবে

মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়,—কারণ, গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী-সাহিত্য বহুকাল বিনা পরিবর্ত্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।

কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মত নূতন চাল চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্ত্তনের হাত পড়িয়াছে। এজন্য গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা আমাকে লিখিতেছেন :—

"প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উহা জানেন না। দুই এক জন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এ দেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই একজন মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করে দেখিতে পাই। তাহাদের কথিত ছড়াগুলি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক। এইরূপ বৈষ্ণবী সচরাচর মেলে না এবং মিলিলেও অনেকেই একবিধ ছড়াই গাহিয়া থাকে। এমত স্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈষ্ণবীর সাহায্য আবশ্যক। তবে শস্য-শ্যামলা মাতৃ-ভূমির কৃপায় প্রতিসপ্তাহে অন্তত দুই একটি বিদেশিনী নূতন বৈষ্ণবীর "জয় রাধে" রব শুনিতে পাওয়া বড় কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

পূর্ব্বে গ্রাম্যছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরও সাহিত্য-রস-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিণী ও পিতামহীদের মুখে মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। এখন তাঁহারা অনেকেই পড়িতে শিখিয়াছেন—

বাংলার ছাপাখানার সাহিত্য তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে। এখন গ্রাম্য-ছড়াগুলি বোধ করি সমাজের অনেক নীচের স্তরে নামিয়া গেছে।

ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়। হরগৌরী বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ক। হরগৌরী বিষয়ে বাঙালীর ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালীর ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। এক দিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।

দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে, দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য শৈলটাকে বেষ্টন করিয়া হরগৌরীর কাহিনী নানাদিক্ হইতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। কখন বা শ্বশুরশাশুড়ির স্নেহ সেই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে কখন বা স্ত্রীপুরুষের প্রেম সেই দারিদ্র্যের উপরে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে।

বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই। আমার সম্বল নাই যে বলে সেই গরীব—আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের! শিব ত তাহারই আদর্শ।

অন্য দেশের ন্যায় ধনের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই—অন্তত পূর্ব্বে ছিল না। যে বংশে বা গৃহে কুলশীল সম্মান আছে সে বংশে বা গৃহে ধন নাই এমন সম্ভাবনা আমাদের দেশে বিরল নহে। এইজন্য আমাদের দেশে ধনী ও নির্দ্ধনের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান সর্ব্বদাই চলিয়া থাকে।

কিন্তু সামাজিক আদর্শ যেমনি হোক্ ধনের একটা স্বাভাবিক মত্ততা

আছে। ধনগৌরবে দরিদ্রের প্রতি ধনী কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া থাকে। যেখানে সামাজিক উচ্চনীচতা নাই সেখানে ধনের উচ্চনীচতা আসিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থা দাম্পত্যসম্বন্ধে একটা মস্ত বিপাকের কারণ। স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনীকন্যা দরিদ্র পতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে তখন গৃহধর্ম্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে।

দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায় হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান, তাহার আর একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতামোচন, মহত্ত্ব-কীর্ত্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্যবন্ধনের আর একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্দ্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহসভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপ যৌবন—প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে, তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

গ্রামের কবিপ্রতিভা এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে অসভ্য কোঁচ-কামিনীদের প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রচার করিতে ছাড়ে নাই। কালিদাসের অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র ও নির্বাতনিষ্কম্প দীপশিখাবৎ যোগীশ্বর বাংলার পল্লীতে আসিয়া এমনি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন!

কিন্তু স্থূল কথা এই যে, হরগৌরীর কথা, ছোট বড় সমস্ত বিঘ্নের

উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরীপ্রসঙ্গে আমাদের একান্ন-পারিবারিক সমাজের মর্ম্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হোক, স্ত্রী রূপ যৌবন ভক্তি প্রীতি ক্ষমা ধৈর্য্য তেজ গর্ব্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মান লক্ষ্মী।

হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্য্যের গান। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি। কারণ, তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে তখন ত সে আপন তত্ত্বরূপ গোপন করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এই জন্যই তাহা ছড়ায়, গানে, যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।

সৌন্দর্য্যসূত্রে নরনারীর প্রেমের আকর্ষণ সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচারিত। কেবল সামাজিক কর্ত্তব্যবন্ধনে ইহাকে সম্পূর্ণ কুলাইয়া পায় না। সমাজের বাহিরেও ইহার শাসন বিস্তৃত। পঞ্চশরের গতিবিধি সর্ব্বত্রই, এবং বসন্ত অর্থাৎ জগতের যৌবন এবং সৌন্দর্য্য তাঁহার নিত্য-সহচর।

নরনারীর প্রেমের এই যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তি-বলে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্র সূর্য্য তারা পুষ্পকানন নদ-নদীকে একসূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া আনে, যে প্রেমের শক্তি আকস্মিক অনির্ব্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বিশ্ব জগৎকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণরূপ কৃতকৃতার্থ করিয়া তোলে,—সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছে।

তাহার প্রমাণ সলোমন্, হাফেজ এবং বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী। দুইটি মনুষ্যের প্রেমের মধ্যে এমন একটি বিরাট বিশ্বব্যাপকতা আছে যে আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মনে হয়, সেই প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ সেই দুইটি মনুষ্যের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত নহে ; তাহা ইঙ্গিতে জগৎ ও জগদীশ্বরের মধ্যবর্ত্তী অনন্তকালের সম্বন্ধ ও অপরিসীম ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে।

কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্ব্বচনীয়। যদিও স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্য মেলামেশা ও স্বাধীন বরণের অভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের কবিরা নানা ছলে নানা কৌশলে ইহাকে তাঁহাদের কাব্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা না করিয়া কাব্যকে সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। মালিনী নদীতীরে তপোবনে সহকারসনাথ বনজ্যোৎস্না-কুঞ্জে নবযৌবনা শকুন্তলা সমাজকারাবাসী কবিহৃদয়ের কল্পনাস্বপ্ন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম সমাজের অতীত, এমন কি, তাহা সমাজবিরোধী। পুরুরবার প্রেমোন্মত্ততা সমাজবন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া নদীগিরিবনের মধ্যে মদমত্ত বন্য হস্তীর মত উদ্দামভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে। মেঘদূত বিরহের কাব্য। বিরহাবস্থায় দৃঢ়বদ্ধ দাম্পত্যসূত্রে কিঞ্চিৎ ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বতন্ত্রভাবে ভালবাসিবার অবসর লাভ করে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সেই ব্যবধান পড়ে যেখানে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়। কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী যদি প্রচলিত সমাজনিয়মের বিরুদ্ধে শৈলতপোবনে একাকিনী মহাদেবের সেবা না করিতেন তবে তৃতীয় সর্গের ন্যায় অমন অতুলনীয় কাব্যের সৃষ্টি হইত কি করিয়া? একদিকে বসন্তপুষ্পাভরণা শিরীষপেলবা বেপথুমতী উমা, অন্যদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধ-

স্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়, লোকালয়ের নিয়মপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান্ সুযোগ মিলিত কোথায়?

যাহা হউক, মানবরচিত সমাজ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। যে শক্তি সমাজকে সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য্য সেই প্রেমের শক্তিকে অন্তত মানসলোকে স্থাপন করিয়া কল্পনার দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পার্থিব সমাজে যদি বা বাধা পায় তবে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্ণবের গান যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাই তাহার প্রধান কারণ। বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না! অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্য্যবন্ধনে হৃদয়বন্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে।

হরগৌরীর কথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। তাহা একাই এক সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দ্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্ব্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ সংসার স্থান কাল পাত্র এবং যুক্তি তর্ক কার্য্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্ব্বত্রই একবাক্যে নিন্দিত, সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত

প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন! এই সর্ব্বনাশী, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্যহিসাবে ক্ষতি হয় না, সমাজনীতিহিসাবে হইবার কথা।

এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মানব প্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। তাহা কাজে, কথায়, কল্পনায় আপনাকে নানাপ্রকারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। তাহা এক দিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া আর এক দিক্ দিয়া প্রবাহিত হয়। মানবপ্রকৃতিকে অযথাপরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। সে অবস্থায় যখন সেই রুদ্ধপ্রকৃতি কোন একটা আকারে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের কতকটা লাঘব হয়। আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজ-বিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্ন রাত্রে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য,—বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্য্যক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবন্ধ কল্পনার বিবিধ পরশ পাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা

বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে। বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ মধ্যে পূত সূর্য্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশ পথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণব কবি যে জিনিষটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন;—ইনি সেইটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মত ছাপিয়া দিয়াছেন, যে দেখিতেছে সেই কৌতুক অনুভব করিতেছে।

যাহা হউক্, মোটের উপর, হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহিত্য রচিত। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলা দেশের একটা বড় মর্ম্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মত দায় নাই। কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টং। সমাজের অনুশাসনে নির্দ্দিষ্ট বয়স এবং সঙ্কীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়না বশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায় তাহার রূপ গুণ অর্থ সামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্ম্মবেদনা সর্ব্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমন কি, নাম মাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই,—কেবল কন্যাকেই

ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্ম্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বদাই সেই ক্ষত বেদানায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারে সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই সকল কারণে হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্ত্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।

"শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন ?"

এই স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ। সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা। প্রতিবৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রং কাঁচা সোনার মত হইয়া আসে, তখন গিরিরাণী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন, আর বলেন,—

আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন।

এ স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত, বিভাস এবং রামকেলী রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন। ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে জানি না, হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথমে যে শরতে মেনকারাণী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে—যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায়?

বৎসর গত হয়েছে কত, করছে শিবের ঘর,—
যাও গিরিরাজ আন্‌তে গৌরী কৈলাসশিখর।

বলা বাহুল্য, গিরিরাজ নিতান্ত লঘু লোকটা নহেন। চলিতে ফিরিতে, এমন কি, শোক দুঃখ চিন্তা অনুভব করিতে তাঁহার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সেই সর্ব্বাঙ্গীন জড়তা ও ঔদাসীন্যের জন্য একবার গৃহিণীর নিকট গোটাকয়েক তীব্র তিরস্কার বাক্য শুনিয়া তবে তিনি অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন:—

শুনে কথা গিরিরাজা লজ্জায় কাতর
পঞ্চমীতে যাত্রা করে শাস্ত্রের বিচার।
তা শুনি মেনকারাণী শীঘ্রগতি ধরি
খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।
মিশ্রি সাঁচ চিনির ফেণী ক্ষীর তক্তি সরে
চিনির ফেণা এলাচদানা মুক্তা থরে থরে।
ভাঙের লাড়ু সিদ্ধি বলে পঞ্চমুখে দিলেন,
ভাণ্ড ভরি গিরিরাজ তখনি সে নিলেন।—

কিন্তু দৌত্য কার্য্যে যেরূপ নিপুণতা থাকা আবশ্যক হিমালয়ের

নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। কৈলাসে কন্যার সহিত অনর্থক বচসা করিয়া তাঁহার বিপুল স্থূল প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। দোষের মধ্যে অভিমানিনী তাঁকে বলিয়াছিলেন—

কহ বাবা নিশ্চয়, আর ক'ব পাছে—
সত্য করি বল আমার মা কেমন আছে?
তুমি নিঠুর হয়ে কুঠুর মনে পাসরিলা ঝি,
শিব নিন্দা করচ কত আর বল্‌ব কি?

সত্য দোষারোপে ভালমত উত্তর জোগায় না বলিয়া রাগ বেশি হয়। গিরিরাজ সুযোগ পাইলে শিব নিন্দা করিতে ছাড়েন না; একথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

মা, তুমি বল নিঠুর কুঠুর শম্ভু বলেন শিলা—
ছার মেনকার বুদ্ধি শুনে তোমায় নিতে এলাম!
তখন শুনে কথা জগৎ মাতা কাঁদিয়া অস্থির,
পাঢ়া মেঘের বৃষ্টি যেন পল এক রীত।
নয়ন জলে ভেসে চলে, আকুল হল নন্দী,
কৈলাসেতে মিল্‌ল ঝরা হল একটি নদী।
—কেঁদনা মা, কেঁদনা মা, ত্রিপুর সুন্দরী,
কাল তোমাকে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী।
সন্দেশ দিয়াছিলেন মেনকারাণী দিলেন দুর্গার হাতে,
তুষ্ট হয়ে নারায়ণী ক্ষান্ত পেলেন তাতে।
উমা কন শুন বাবা বস পুনর্ব্বার।
জলপান করিতে দিলেন নানা উপহার।
যত্ন করি মহেশ্বরী রান্ধন করিলা,
শ্বশুর জামাতা দোঁহে ভোজন করিলা।

ছড়া যাহাদের জন্য রচিত তাহারা যদি আজ পর্য্যন্ত ইহার ছন্দোবন্ধ

ও মিলের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না করিয়া থাকে তবে আমাদের বলিবার কোন কথাই নাই,—কিন্তু জামাতৃগৃহে সমাগত পিতার সহিত কন্যার মান অভিমান ও তাহার শান্তি ও পরে আহার অভ্যর্থনা—এই গৃহচিত্র যেন প্রত্যক্ষের মত দেখা যাইতেছে। নন্দীটা এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল সে মাঝ হইতে আকুল হইয়া গেল! শ্বশুরজামাতা ভোজনে বসিয়াছেন এবং গৌরী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া উভয়কে পরিবেষণ করিতে-ছেন এ চিত্র মনে গাঁথা হইয়া রহিল।

শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী,
ইচ্ছা হয় যে বাপের বাড়ি কাল যাইব আমি।
শুন গৌরী কৈলাসপুরী তুচ্ছ তোমার ঠাঁই;—
দেখ্‌ছি তোমার কাঙাল পিতার ঘর দরজা নাই।

শেষ দুটি ছত্র বুঝিতে একটু গোল হয়, ইহার অর্থ এই যে, তোমার বাসের পক্ষে কৈলাসপুরীই তুচ্ছ এমন স্থলে তোমার কাঙাল পিতা তোমাকে স্থান দিতে পারেন এমন সাধ্য তাঁহার কি আছে!

পতিকে লইয়া পিতার সহিত বিরোধ করিতে হয় আবার পিতাকে লইয়া পতির সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠে—উমার এমনি অবস্থা!

গৌরী কন আমি কৈলে মিছে দন্দেজ হবে,
সেই যে আমার কাঙাল পিতা ভিক্ষা মাংছেন কবে?
তারা রাজার বেটা দালান কোঠা অট্টালিকাময়
জাগযজ্ঞ করচে কত শ্মশানবাসী নয়।
তারা নানা দান পুণ্যবান্ দেব কার্য্য করে
এক দফাতে কাঙাল বটে ভাং নাই তার ঘরে!

কিন্তু কড়া জবাব দিয়া কার্য্যোদ্ধার হয় না। বরং তর্কে পরাস্ত হইলে গায়ের জোর আরো বাড়িয়া উঠে। সেই বুঝিয়া দুর্গা তখন

গুটি পাঁচ ছয় সিদ্ধির লাড়ু যত্ন করে দিলেন

দাম্পত্যযুদ্ধে এই ছয়টি সিদ্ধির লাড়ু কামানের ছয়টা গোলার মত কাজ করিল—ভোলানাথ এক দমে পরাভূত হইয়া গেলেন। সহসা পিতা, কন্যা ও জামাতার ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়া গেল। বাক্যহীন নন্দী সকৌতুক ভক্তিভরে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

সম্ভ্রমে সম্ভাষণ করি বস্‌লেন তিন জন।
দুর্গা, মর্ত্ত্যে যেয়ে কি আনিবে আমার কারণ?
প্রতিবারে কেবলমাত্র বিল্বপত্র পাই।
দেবী বল্লেন প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই!
সিঁদুর ফোঁটা অলক ছটা মুক্তা গাঁথা কেশে।
সোনার ঝাঁপা কনক চাঁপা শিব ভুলেচেন যে বেশে।
রত্নহার গলে তার দুল্‌চে সোনার পাটা,
চাঁদনি রাত্রিতে যেন বিদ্যুৎ দিচ্চে ছটা!
তাড় কঙ্কণ সোন্ পৈঁছি শঙ্খ বাহুমূলে,
বাঁক পরামল সোনার নূপুর, আঁচল হেলে দোলে।
সিংহাসন, পট্টবসন পরচে ভগবতী,
কার্ত্তিক গণেশ চল্লেন লক্ষ্মী সরস্বতী।
জয়া বিজয়া দাসী চল্লেন দুই জন।
গুপ্তভাবে চল্লেন শেষে দেব পঞ্চানন।
গিরিসঙ্গে পরম রঙ্গে চল্লেন পরম সুখে,
ষষ্ঠী তিথিৎ উপনীত হলেন মর্ত্ত্য লোকে।
সারি সারি ঘট বারি আর গঙ্গাজল
সাবধানে নিজ মনে গাচ্চেন মঙ্গল।

তখন—

গিরিরাণী কন্ বাণী চুমো দিয়ে মুখে
কও তারিণী জামাই ঘরে ছিলে কেমন সুখে?

এ ছড়াটি এইখানে শেষ হইল—ইহার বেশি আর বলিবার কথা নাই। এদিকে বিদায়ের কাল সমাগত। কন্যাকে লইয়া শ্বশুর ঘরের সহিত বাপের ঘরের ঈর্ষার ভাব থাকে। বেশি দিন বধূকে বাপের বাড়িতে রাখা শ্বশুর পক্ষের মনঃপূত নহে। বহুকাল পরে মাতায় কন্যায় যথেষ্ট পরিতৃপ্তি-পূর্ব্বক মিলন হইতে না হইতেই শ্বশুরবাড়ি হইতে তাগিদ আসে, ধন্না বসিয়া যায়। স্ত্রী-বিচ্ছেদ, বধূর স্বামার অধৈর্য্য, তাহার কারণ নহে। হাজার হউক্ বধূ পরের ঘর হইতে আসে,—শ্বশুরঘরের সহিত তাহার সম্পূর্ণ জোড় লাগা বিশেষ চেষ্টার কাজ। সেখানকার নূতন কর্ত্তব্য, অভ্যাস ও পরিচয় বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বাল্যকালের স্বাভাবিক আশ্রয় স্থলে ঘন ঘন যাতায়াত বা দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে দিলে জোড় লাগিবার ব্যাঘাত করে। বিশেষত বাপের বাড়িতে বিবাহিতা কন্যার কেবলই কর্ত্তব্যহীন আদর, শ্বশুর বাড়িতে তাহার কর্ত্তব্যের শাসন, এমন অবস্থায় দীর্ঘকাল বাপের বাড়ির আবহাওয়া শ্বশুরবর্গ বধূর পক্ষে প্রার্থনীয় জ্ঞান করেন না। এই সকল নানা কারণে পিতৃগৃহে কন্যার গতিবিধিসম্বন্ধে শ্বশুরপক্ষীয়ের বিধান কিছু কঠোর হইয়াই থাকে। কন্যা-পিতৃত্বের সেও একটা কষ্ট। বিজয়ার দিন বাংলা দেশের শ্বশুর বাড়ির সেই কড়া তাগিদ্ লইয়া শিব মেনকার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অধিকার সমাজশাসনের বিরুদ্ধে বৃথা আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল।

নাহি কাজ গিরিরাজ শিবকে বল যেয়ে
অমনি ভাবে ফিরে যাক্ সে থাকবে আমার মেয়ে।

তখন, শ্বশুর বাড়িতে দুর্গার যত কিছু দুঃখ আছে সমস্ত মাতার মনে পড়িতে লাগিল। শিবের ভাণ্ডারে যত অভাব, আচরণে যত ত্রুটি, চরিত্রের যত দোষ সমস্ত তাঁহার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। অপাত্রে কন্যাদান করিয়াছেন এখন সেটা যতটা পারেন সংশোধন করিবার ইচ্ছা,

যতটা সম্ভব গৌরীকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা। শ্বশুরগৃহের আচারবিচার অনেক সময় দূর হইতে পিতৃগৃহের নিকট অযথা বলিয়া মনে হয় এবং পিতৃপক্ষীয়েরা স্নেহের আক্ষেপে কন্যার সমক্ষেই তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন। মেনকা তাই সুরু করিলেন,—এবং শিব সেই অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্বশুর বাড়ির অনুশাসন সতেজে প্রচার করিয়া দিলেন।

মর্ত্ত্যে আসি পূর্ব্ব কথা ভুলচ দেখি মনে,
বারে বারে নিষেধ তোমায় করচি এ কারণে।
মায়ের কোলে মত্ত হয়ে ভুলচ দেখি স্বামী,
তোমার পিতা কেমন রাজা তাই দেখ্‌ব আমি।
শুনে কথা গিরিরাজা উদ্যযুক্ত হলো,
জয় জোগাড়ে অভয়ারে যাত্রা করে দিল।
যে নিবে সে ক'তে পারে নৈলে এমন শক্তি কার,
যাও তারিণী হরের ঘরে, এসো পুনর্ব্বার।

অনুগ্রহের সঙ্কীর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল, কন্যা পতিগৃহে ফিরিয়া গেল।

এক্ষণে যে ছড়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে দেবদেবীর একটি গোপন ঘরের কথা বর্ণিত আছে।

শিব সঙ্গে রসরঙ্গে বসিয়ে ভবানী।
কুতূহলে উমা বলেন ত্রিশূল শূলপাণি,
তমি প্রভু তুমি প্রভু ত্রৈলোক্যের সার ;
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ তোমারি কিঙ্কর।
তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে,
যেন বেন্ধা পতির কপালে পড়ে রমণী ঝোরে।
দিব্য সোনার অলঙ্কার না পরিলাম গায়,
শাখের বরণ দুই শঙ্খ পর্‌তে সাধ যায়।

দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি;
বারেক মোরে দাও শঙ্খ তোমার ঘরে পরি।

ভোলানাথ ভাবিলেন, একটা কৌতুক করা যাক্ প্রথমেই একটু কোন্দল বাধাইয়া তুলিলেন ঃ—

ভেবে ভোলা হেসে কন শুনহে পার্ব্বতী
আমিত কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারী শঙ্খ পাব কথি?
হাতের শিঙাটা বেচলা পরে হবে না
একখানা শঙ্খের কড়ি,
বলদটা মূল করিলে হবে কাহনটেক কড়ি।
এটি ওটি ঠাক ঠিকাটি চাওহে গৌরী
থাকলে দিতে পারি।
তোমার পিতা আছে বটে অর্থের অধিকারী;
সে কি দিতে পারে না ছুমুটো শঙ্খের মুজুরি?

এই যে ধনহীনতার ভড়ং এটা মহাদেবের নিতান্ত বাড়াবাড়ি, স্ত্রীজাতির নিকট ইহা স্বভাবতই অসহ্য। স্ত্রী যখন ব্রেস্‌লেট্ প্রার্থনা করে কেরাণী বাবু তখন আয়ব্যয়ের সুদীর্ঘ হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আপন দারিদ্র্য প্রমাণ করিতে বসিলে কোন্ ধর্ম্মপত্নী তাহা অবিচলিত রসনায় সহ্য করিতে পারে? বিশেষত শিবের দারিদ্র্য ওটা নিতান্তই পোষাকী দারিদ্র্য, তাহা কেবল ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সকলের উপরে টেক্কা দিবার জন্য, কেবল লক্ষ্মীর জননী অন্নপূর্ণার সহিত একটা অপরূপ কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে। কালিদাস শঙ্করের অট্টহাস্যকে কৈলাস শিখরের ভীষণ তুহিনপুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন, মহেশ্বরের শুভ্র দারিদ্র্যও তাঁহার এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য। কিন্তু দেবতার পক্ষেও কৌতুকের একটা সীমা আছে। মহাদেবী এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব যেরূপে ব্যক্ত করিলেন তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহাতে কোন কথাই ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রহিল না।

গৌরী গর্জ্জিয়ে কন ঠাকুর শিবাই
আমি গৌরী তোমার হাতে শঙ্খ পরতে চাই।
আপুনি যেমন যুব্‌যুবতী অমনি যুবক পতি হয়
তবে সে বৈরস রস নৈলে কিছুই নয়।
আপনি বুড়া আধ্‌বয়সী ভাঙধুতুরায় মত্ত
আপনার মত পর্‌কে বলে মন্দ!

এই থানে শেষ হয় নাই—ইহার পরে দেবী মনের ক্ষোভে আরও দুই চারিটি যে কথা বলিয়াছেন তাহা মহাদেবের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে—তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ যোগ্য নহে। সুতরাং আমরা উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ব্যাপারটা কেবল এইখানেই শেষ হইল না; স্ত্রীর রাগ যত দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে—অর্থাৎ বাপের বাড়ি পর্য্যন্ত—তাহা গেল।

কোলে করি কার্ত্তিক হাঁটায়ে লম্বোদরে
ক্রোধ করি হরের গৌরী গেলা বাপের ঘরে।

এ দিকে শিব তাঁহার সংকল্পিত দাম্পত্য প্রহসনের নেপথ্যবিধান সুরু করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা এনে করান্ শঙ্খের গঠন।
শঙ্খ লইয়া শাঁখারি সাজিয়া বাহির হইলেন।
দুই বাহু শঙ্খ নিলেন নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
কপটভাবে হিমালয়ে তলাসে ফেরেন।
হাতে শূলী কাঁথে থলি শম্ভু ফেরে গলি গলি
শঙ্খ নিবি শঙ্খ নিবি এই কথাটি বলে।
সখীসঙ্গে বসে গৌরী আছে কুতূহলে
শঙ্খ দেখি শঙ্খ দেখি এই কথাটি বলে।
গৌরীকে দেখায়ে শাঁখারি শঙ্খ বাহির ক'ল্ল
শঙ্খের উপরে যেন চন্দ্রের উদয় হ'ল।

মণি মুকুতা প্রবাল গাঁথা মাণিক্যের ঝুরি,
নব ঝলকে ঝল্‌চে যেন ইন্দ্রের বিজুলি।

দেবী খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

শাঁখারি ভাল এনেছ শঙ্খ
শঙ্খের কত নিবে তঙ্ক।

দেবীর লুব্ধভাব দেখিয়া চতুর শাঁখারি প্রথমে দরদামের কথা কিছুই আলোচনা করিল না—কহিল

গৌরী,
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ হরের কৈলাস এত সবাই কয়;
বুঝে দিলেই হয়।
হস্ত ধুয়ে পর শঙ্খ দেরি উচিত নয়।

শাঁখারি মুখে মুখে হরের স্থাবর সম্পত্তির যেরূপ ফর্দ্দ দিল তাহাতে শাঁখা জোড়া যে বিশেষ সস্তায় যাইবে মহাদেবীর এমন মনে করা উচিত ছিল না।

গৌরী আর মহাদেব কথা হল দড়
সকল সখী বলে, দুর্গা শঙ্খ চেয়ে পর!
কেউ দিলেন তেল গাম্‌ছা কেউ জলের বাটি,
দেবের উরুতে হস্ত থুয়ে বসলেন পার্ব্বতী।
দয়াল শিব বলেন, শঙ্খ আমার কথাটি ধর
দুর্গার হাতে গিয়ে শঙ্খ বজ্র হয়ে থাক।
শিলে নাহি ভেঙ শঙ্খ খড়্গো নাহি ভাঙ
দুর্গার সহিত করেন বাক্যের তরঙ্গ।
একথা শুনিয়া মাতা মনে মনে হাসে,
শঙ্খ পরান জগৎ পিতা মনের হরষে।

শাঁখারি ভাল দিলে শঙ্খ মানায়ে,
ভাণ্ডার ভেঙে দেইগে তঙ্ক লওগে গণিয়ে।

এতক্ষণে শাঁখারি সময় বুঝিয়া কহিল—

আমি যদি তোমার শঙ্খের লব তঙ্ক
জ্ঞেয়াৎ মাঝারে মোর রহিবে কলঙ্ক!

ইঁহারা যে-বংশের শাঁখারি তাঁহাদের কুলাচার স্বতন্ত্র; তাঁহাদের বিষয়বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই; টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড় নিস্পৃহ; ইঁহারা যাঁহাকে শাঁখা পরান তাঁহাকে পাইলেই মূল্যের আর কোন প্রকার দাবী রাখেন না। ব্যবসায়টী অতি উত্তম!

কেমন কথা কও শাঁখারী কেমন কথা কও,
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারী এসব কথা কও!

শাঁখারী কহিল—

না কর বড়াই দুর্গা না কর বড়াই,
সকল তত্ত্ব জানি আমি এই বালকের ঠাঁই!
তোমার পতি ভাঙড় শিব তাত আমি জানি।
নিতি নিতি প্রতিঘরে ভিক্ষা মাঙেন তিনি।
ভস্মমাখা তায় ভুজঙ্গ মাথে অঙ্গে
নিরবধি ফেরেন তিনি ভূত প্রেতের সঙ্গে!

ইহাকেই বলে শোধ তোলা! নিজের সম্বন্ধে যে সকল স্পষ্ট ভাষা মহাদেব সহধর্ম্মিণীর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আসিয়াছেন, অদ্য সুযোগ মত সেই সত্য কথাগুলিই গৌরীর কানে তুলিলেন।

এই কথা শুনি মায়ের রোদন বিপরীত,
বাহির কর্‌তে চান শঙ্খ না হয় বাহির।
পাষাণ আনিল চণ্ডী শঙ্খ না ভাঙ্গিল
শঙ্খেতে ঠেকিয়া পাষাণ খণ্ড খণ্ড হল!

কোনরূপে শঙ্খ যখন না হয় কর্ত্তন
খড়্গ দিয়ে হাত কাটিতে দেবীর গেল মন।
হস্ত কাটিলে শঙ্খে ভরিবে রুধিরে,
রুধির লাগিলে শঙ্খ নাহি লব ফিরে।
মেনকা গো মা,
কি কুক্ষণে বাড়াছিলাম পা।
মরিব মরিব মাগো হব আত্মঘাতী
আপনার গলে দিব নরসিংহ কাতী।

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন—

ধ্যানে পেলেন মহাদেবের চরণ দুখান।

তথন ব্যাপারটা বুঝা গেল,—দেবতার কৌতুকের পরিসমাপ্তি হইল।

কোথা বা কন্যা, কোথা বা জামাতা,
সকলেই দেখি যেন আপন দেবতা।

এ যেন ঠিক স্বপ্নের মত হইল। নিমেষের মধ্যে—

দুর্গা গেলেন কৈলাসে শিব গেলেন শ্মশানে।
ভাং ধুতুরা বেঁটে দুর্গা বস্‌লেন আসনে।
সন্ধ্যা হলে দুই জনে হলেন একখানে।

এইখানে চতুর্থ ছত্রের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছড়া শেষ হইয়া গেল।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালী ছড়া রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানস রাজ্য।

স্থানে স্থানে ফেরেন রাখাল সঙ্গে কেহ নাই
ভাণ্ডী বনে ধেনু চরাণ সুবল কানাই।

সুবল বলিছে শুন ভাইরে কানাই
আজি তোরে ভাণ্ডীবন-বিহারী সাজাই।

এই সাজাইবার প্রস্তাব মাত্র শুনিয়া নিকুঞ্জে যেখানে যত ফুল ছিল সকলেই আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কদম্বের পুষ্প বলেন সভা বিদ্যমানে
সাজিয়া দুলিব আজি গোবিন্দের কানে।
করবীর পুষ্প বলেন আমার মর্ম্ম কেবা জানে
আজ আমায় রাখবেন হরি চূড়ার সাজনে।
অলক ফুলের কনক নাম বেলফুলের গাঁথুনি
আমায় হৃদয়ে শ্যাম দুলাবে চূড়ামণি।
আনন্দেতে পদ্ম বলেন তোমরা নানা ফুল
আমায় দেখলে হবে চিত্ত ব্যাকুল।
চরণ তলে থাকি আমি কমল পদ্ম নাম
রাধাকৃষ্ণ একাসনে হেরিব বয়ান।

কোন ফুলকেই নিরাশ হইতে হইল না,—সে দিন তাহাদের ফুটিয়া ওঠা সার্থক হইল।

ফুলেরি উড়ানি ফুলেরি জামাজুরি
সুবল সাজাইলি ভাল।
ফুলেরি পাগ, ফুলেরি পোষাক
সেজেছে বিহারীলাল।
নানা আভরণ ফুলেরি ভূষণ
চূড়াতে করবী ফুল,
কপালে কিরীটি অতি পরিপাটি
পড়েছে চাঁচর চুল।

এ দিকে কৌতুহলী ভ্রমর ভ্রমরী ময়ূর ময়ূরী খঞ্জন খঞ্জনীর মেলা

বসিয়া গেল। যে সকল পাখীর কণ্ঠ আছে তাহারা সুবলের কলা-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল,—কোকিল সস্ত্রীক আসিয়া বলিয়া গেল "কিঙ্কিণী কিরীটি অতি পরিপাটী।"

ডাহুক ডাহুকী টিয়া টুয়া পাখী
ঝঙ্কারে উড়িয়া যায়—

তাহারা ঝঙ্কার করিয়া কি কথা বলিল?

সুবল রাখাল সাজায়েছে ভাল
বিনোদ বিহারী রায়।

এ দিকে চাতক চাতকী শ্যামকে মেঘ ভ্রম করিয়া উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া জল দে জল দে বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনের মধ্যে শাখায় পল্লবে বাতাসে আকাশে ভারি একটা রব পড়িয়া গেল।

কানাই বলিছে প্রাণের ভাইরে সুবল
কেমনে সাজালে ভাই বল দেখি বল!

কানাই জানেন তাঁহার সাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। কোকিল কোকিলা আর ডাহুক ডাহুকীরা যাহাই বলুক না কেন, সুবলের রুচি এবং নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবার সময় হয় নাই।

নানাফুলে সাজালে ভাই বামে দাও প্যারী
তবে তো সাজিবে তোর বিনোদ বিহারী!

বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান ফুলটিই বাকী ছিল। সেই অভাবটা পশু-পক্ষীদের নজরে না পড়িতে পারে কিন্তু শ্যামকে যে বাজিতে লাগিল।

কুঞ্জপানে যে দিকে ভাই চেয়ে দেখি আঁখি
সুখময় কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি।

তখন লজ্জিত সুবল কহিল—

এই স্থানে থাক তুমি নবীন বংশীধারী
খুঁজিয়া মিলাব আজ কঠিন কিশোরী।

এ দিকে ললিতা বিশাখা সখীদের মাঝখানে রাধিকা বসিয়া আছেন :—

স্থবলকে দেখিয়া সবাই হয়ে হরষিত
এস এস বস স্থবল একি অচরিত।

স্থবল সংবাদ দিল।—

মন্দ মন্দ বহিতেছে বসন্তের বা পত্র পড়ে গলি
কাঁদিয়া বলেন কৃষ্ণ কোথায় কিশোরী!

কৃষ্ণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া রাধা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন—

সাধ ক'রে হার গেঁথেছি সই দিব কার গলে?
ঝাঁপ দিয়ে মরিব আজ যমুনার জলে।

রাই অনাবশুক এইরূপ একটা দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক ব্যাপার ঘটাইবার জন্ম মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অবশেষে সখীদের সহিত রফা করিয়া বলিলেন :—

যেই সাজে আছি আমি এই বৃন্দাবনে
সেই সাজে যাব আমি কৃষ্ণদরশনে।
দাঁড়ালো দাঁড়ালো সই বলে সহচরী
ধীরে যাও ফিরে চাও রাধিকা স্থন্দরী।

রাধিকা সখীদের ডাকিয়া বলিলেন—

তোমরা গো পিছে এস সাথে করে দই
নাথের কুশল হোক্ ঝটিৎ এস সই।

রাধা প্রথম আবেগে যদিও বলিয়াছেন, যে সাজে আছেন সেই সাজেই যাইবেন কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না।

হালিয়া মাথায় বেণী বামে বাঁধি চুড়া
অলকা তিলকা দিয়ে এঁটে পরে ধড়া।
ধড়ার উপরে তুলে নিলেন স্থবর্ণের ঝরা;

সোনার বিজটা শোভে হাত তাড়বালা,
গলে শোভে পঞ্চরত্ন তক্তি কণ্ঠমালা।
চরণে শোভিছে রাইয়ের সোনার নূপুর,
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে বাজিছে মধুর।
চিন্তা নাই চিন্তা নাই বিশাখা এসে বলে
ধবলীর বৎস একটি তুলে লও কোলে।

সখীরা সব দধির ভাণ্ড মাথায় এবং রাধিকা ধবলীর এক বাছুর কোলে লইয়া গোয়ালিনীর দল ব্রজের পথ দিয়া শ্যাম দরশনে চলিল। কৃষ্ণ তখন রাধিকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে অচেতন।

সাক্ষাতে দাঁড়ায়ে রাই বলিতেছে বাণী
কি ভাব পড়িছে মনে শ্যাম গুণমণি।
যে ভাব পড়েছে মনে সেই ভাব আমি!

রাধিকা সগর্ব্বে সবিনয়ে কহিলেন, তোমারি অন্তরের ভাব আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ বিরাজমান।

গাও তোল চক্ষু মেল ওহে নীলমণি
কাঁদিয়ে কাঁদাও কেন আমি বিনোদিনী।
অঞ্চলেতে ছিল মালা দিল কৃষ্ণের গলে
রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ভাণ্ডীর বনে।

ভাণ্ডীর বন-বিহারীর সাজ সম্পূর্ণ হইল—সুবলের হাতের কাজ সমাধা হইয়া গেল।

ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলার গ্রামদৃশ্য গৃহচিত্র কিছুই নাই। গোয়ালিনীরা যেরূপ সাজে নূপুর কিঙ্কিণী বাজাইয়া দধি মাথায় বাছুর কোলে বনপথ দিয়া চলিয়াছে, তাহা বাংলার গ্রামপথে প্রত্যহ অথবা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাখালেরা মাঠের মধ্যে বটচ্ছায়ায় অনেক রকম খেলা করে কিন্তু ফল হইয়া তাহাদের ও তাহাদিগকে

লইয়া কুলের এমন মাতামাতি শুনা যায় না। এ সমস্ত ভাবের সৃষ্টি। কৃষ্ণরাধার বিরহ মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ মিলনের আদর্শ; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ বা মনুসংহিতা নাই,—ইহার আগাগোড়া রাখালী কাণ্ড। যেখানে সমাজ বলবান্ সেখানে বৃন্দাবনের সঙ্গে মথুরার রাজ্য পালনের একাকার হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। কিন্তু কৃষ্ণরাধার কাহিনী যে ভাবলোকে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহার কোন কৈফিয়ৎ আবশ্যক করে না। এমন কি, সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজ-প্রথাকে অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে কর্ম্মবিভাগ, শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ় বদ্ধমূল সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এইপ্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনবিহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।

কৃষ্ণ মথুরায় রাজত্ব করিতে গেলে রাধিকা কাঁদিয়া কহিলেন—

আর কি এমন ভাগ্য হবে ব্রজে আস্‌বে হরি,
সে গিছে মথুরাপুরী, মিথ্যে আশা করি।

রাজাকে পুনরায় রাখাল করিবার আশা দুরাশা এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বৃন্দা বৃন্দাবনের আসল কথা বোঝে, সে জানে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই—সে জানে বৃন্দাবন মথুরার কাণ্ডাকাণ্ডির নিয়ম ঠিক খাটে না।

বৃন্দে বলে আমি যদি এনে দিতে পারি
তবে মোরে কি ধন দিবে বলত কিশোরী!
শুনে বাণী কমলিনী যেন পড়িল ধন্দে
দেহ প্রাণ করেছে দান কৃষ্ণ পদারবিন্দে।

এক কালেতে যাঁক সঁপেছি বিরাগ হলেন তাঁই
যম সম কোন দেবতা রাধিকার নাই।
ইহা বই নিশ্চয় কই কোথা পাব ধন?
মোর কেবল কৃষ্ণ নাম অঙ্গের ভূষণ।
রাজার নন্দিনী মোরা প্রেমের ভিখারী ;—
বঁধুর কাছে সেই ধন লয়ে দিতে পারি।
বল্‌ছে দূতী শোন্ শ্রীমতী মিল্‌বে শ্যামের সাথে।
তখন দুজনের দুই যুগল চরণ তাই দিয়ো মোর মাথে!

এই পুরস্কারের কড়ার করাইয়া লইয়া দূতী বাহির হইলেন। যমুনা পার হইয়া পথের মধ্যে—

হাস্যরসে একজনকে জিজ্ঞাসিলেন তবে
কও দেখি কার অধিকারে বসত কর সবে।
সে লোক বল্লে তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
মেঘের ধারা রৌদ্রে যেমন লাগ্‌ল দূতীর গায়।
ননীচোরা রাখাল ছোঁড়া ঠাট করেছে আসি,
চোর বিনে তাকে কবে ডাক্‌ছে গোকুলবাসী!

কৃষ্ণের এই রায় বাহাদুর খেতাবটি দূতীর কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ বোধ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়! এ ত আসল নাম নয়! এ কেবল মূঢ় লোকদিগকে ভুলাইবার একটা আড়ম্বর। আসল নাম বৃন্দা জানে।

চল্‌লেন শেষে কাঙালবেশে উতরিলেন দ্বারে
হুকুম বিনে রাত্রি দিনে কেউ না যেতে পারে।

বহুকষ্টে হুকুম আনাইয়া "বৃন্দাদূতী গেল সভার মাঝে।"

সম্ভাষণ করি দূতী থাক্‌লো কতক্ষণ।
ধড়া চূড়া ত্যাগ করিয়ে মুকুট দিয়েছে মাথে,
সব অঙ্গে রাজ আভরণ বংশী নাইক হাতে।

সোনার মালা কণ্ঠহার বাহুতে বাজুবন্ধ,
শ্বেত চামরে বাতাস পড়ে দেখে লাগে ধন্দ।
নিশান উড়ে ডঙ্কা মারে বল্‌ছে খবরদার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘটা ব্যবস্থা বিচার।
আর এক দরখাস্ত করি শুন দামোদর,
যমুনাতে দেখে এলেম এক তরী মনোহর।
শূন্য হয়ে ভাস্‌চে তরী ঐ যমুনা তীরে,
কাণ্ডারী অভাবে নৌকা ঘাটে ঘাটে ফিরে।
পূর্ব্বে এক কাণ্ডারী ছিল সর্ব্বলোকে কয়
সে চোর পালাল কোথা তাকে ধরতে হয়।
শুন্‌তে পেলেম হেথা এলেম মথুরাতে আছে
হাজির না কর যদি জান্‌তে পাবে পাছে।
—মেয়ে হয়ে কয় কথা পুরুষের ডরায় গা,
সভাসুদ্ধ নিঃশব্দ কেউ না করে রা।—
ব্রজপুরে ঘর বসতি মোর,
ভাণ্ড ভেঙে ননী খেয়ে পালায়েছে চোর।
চোর ধরিতে এই সভাতে আস্‌চে অভাগিনী।
কেমন রাজা বিচার কর জান্‌ব তা এখনি।

বৃন্দা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসম্মান রক্ষা করিয়া ঠিক দস্তরমত কথাগুলি বলিল,—অন্তত কবির রিপোর্ট দৃষ্টে তাহাই বোধ হয়;—তবে উহার মধ্যে কিছু স্পর্দ্ধাও ছিল; বৃন্দা মথুরার উপরে আপন বৃন্দাবনের দেমাক্ ফলাইতে ছাড়ে নাই। "হাজির না হয় যদি জান্‌তে পাবে পাছে" এ কথাটা খুব চড়া কথা;—শুনিয়া সভাস্থ সকলে নিঃশব্দ হইয়া গেল। মথুরার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন—

ব্রজে ছিল বৃন্দা দাসী বুঝি বা অনুমানে,

কোন দিন বা দেখা সাক্ষাৎ ছিল বৃন্দাবনে।

তখন বৃন্দা কচ্চেন, কি জানি তা হবে কদাচিৎ,

বিষয় পেলে অনেক ভোলে মহতের রীত।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃন্দা কহিলেন—

হাতে ননী ডাকুচে রাণী গোপাল কোথা রয়,

ধেনু বৎস আদি তব তৃণ নাহি খায়।

শতদল ভাস্‌তেছে সেই সমুদ্র মাঝে,

কোন্ ছার ধুতুরা পেয়ে এত ডঙ্কা বাজে!

মথুরার রাজত্বকে বৃন্দা ধুতুরার সহিত তুলনা করিল,—তাহাতে মত্ততা আছে কিন্তু বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ কোথায়?

বলা বাহুল্য ইহার পর বৃন্দার দৌত্য ব্যর্থ হয় নাই।

দূতী কৃষ্ণ লয়ে বিদায় হয়ে ব্রজপুরে এল

পশু পক্ষী আদি যত পরিত্রাণ পেল।

ব্রজের ধন্যলতা তমালপাতা ধন্য বৃন্দাবন

ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন।

বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রাম রাবণের কথাও পাওয়া যায় কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চ্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী কথায় স্ত্রী পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ কথায় নায়ক নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে,—কিন্তু তাহার প্রসর সঙ্কীর্ণ—তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্য্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ

নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ কথায় একদিকে কর্ত্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্ব্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোন দেশে কোন সাহিত্যের নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।

১৩০৫।